ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 376- 386
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.220

লোকভাষ্যে বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন

ড. মোঃ রাজিবুল ইসলাম, *সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ*

Received: 22.11.2025; Accepted: 27.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The fundamental structure Bangladeshi society is based on the rural life. The term village is not just a geographical area, it is a historical and cultural concept that has governed the lives, thoughts and values of Bengalis for centuries. Our economy, politics, society and culture have their roots in the villages. For centuries, our rural society was agriculturally dependent, tradition-centered and self-reliant. But over time, the nature of social structure, lifestyle, values and relationships have gradually changed. The spread of education, use of technology, employment abroad, urban communication and the impact of political changes have made today's villages dynamic. The main focus of the present study is to explore how and what's the form of changes has occurred in Bangladesh in the past three decades and its nature.

Keywords: Rural Transformation, Bangladeshi Villages, Modernization Impact, Rural Livelihoods, Socio-cultural Change.

বাংলাদেশ প্রধানত একটি কৃষিনির্ভর গ্রামীণ দেশ। এদেশে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। পরিবর্তনের স্রোত যত দ্রুত নাগরিক সমাজে প্রবাহিত হয় গ্রাম্যসমাজে তা হয় না।[১] গ্রামের সমাজব্যবস্থা মূলত ঐতিহ্যনির্ভর, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক নিয়মকানুনে আবদ্ধ। গ্রামগুলো একসময় ছিল পুরোপুরি কৃষিনির্ভর। পুরুষেরা মাঠে কাজ করতো এবং নারীরা গৃহস্থালির কাজ ও পশু পালনে সাহায্য করতো। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল দুর্বল, বিদুৎ এবং স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতি ছিল খুবই নাজুক। গ্রামের প্রায় সব সিদ্ধান্তই ছিল প্রভাবশালী পরিবারগুলোর হাতে এবং সমাজে নানাবিধ কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণে ছিল অনীহা এবং ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি কঠোরতা। তবে গ্রামীণ জীবনের এক বিশেষ সৌন্দর্য ছিল পারস্পরিক বন্ধন ও সহযোগিতা দিয়ে-একজন আরেকজনের পাশে থাকা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের ফলে গ্রামীণ জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। গ্রামীণ এ পরিবর্তনগুলো সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

গবেষণা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি:

গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তনের কারণ ও স্বরূপ অনুসন্ধানই বর্তমান গবেষণাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। গবেষণাটি সম্পাদনে বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতি বিচারে প্রবন্ধটি কথ্য ইতিহাসভিত্তিক একটি গুণগত গবেষণা।

[১] বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, বুক ক্লাব, ঢাকা, পৃ. ৯।

উদ্দেশ্য অর্জনে প্রাথমিক ও সহায়ক উপকরণ হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রামীণ পরিবর্তনের ধরন জানতে বিভিন্ন বিভাগের ৮টি জেলার (মানিকগঞ্জ, রংপুর, ঝিনাইদহ, নড়াইল, সাতক্ষীরা, খুলনা, নরসিংদী এবং পাবনা) ২০টি গ্রাম উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাছাই করা হয়েছে। গবেষক ব্যক্তিগত যোগাযোগের পাশাপাশি ১৫ জনের একটি প্রশিক্ষিত উপাত্তসংগ্রহকারী উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীকর্তৃক কাঠামোবদ্ধ ও মুক্ত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সাধারণত দীর্ঘ সময় একই গ্রামে বসবাসকারী ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য গবেষণাটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। সময় বিবেচনায় গত দুই দশকে গ্রামীণ পরিবর্তনের কারণ ও স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

গ্রামীণ সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবর্তনের কারণসমূহ:

শিক্ষার প্রসার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিঃ

গ্রামের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। এক সময় গ্রামে শিক্ষার হার ছিলো তুলনামূলকভাবে কম, বিশেষ করে নারীদের মধ্যে। কিন্তু গত দুই দশকে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বহু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। শিক্ষা মানুষের চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধে পরিবর্তন এনেছে তারা এখন নিজেদের অধিকার, ভোটাধিকার ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। তরুণ প্রজন্ম রাজনীতি, সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে। ফলে গ্রামের মানুষ এখন আগের তুলনায় বেশি গণতান্ত্রিক ও যুক্তিবাদী মনোভাব পোষণ করে। শিক্ষা সামাজিক কাঠামোয় এক ধরণের মানসিক বিপ্লব ঘটিয়েছে যা সকল পরিবর্তনের মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। ফুলহরি গ্রামের শিক্ষক মো: হাসান আলী বলেন,

> "আমি এ গ্রামেই জন্মেছি। আগে পড়াশোনার পরিবেশ ছিল না। এখন ফুলহরিতে তিনটি স্কুল, একটি কলেজ আছে। ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনায় আগ্রহী। অনলাইন ক্লাস, মোবাইল, ইন্টারনেট শিক্ষার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সচেতন হচ্ছে-অপরাধ, কুসংস্কার কমেছে। আগে মেয়ে শিশুদের বিয়ে হতো অল্প বয়সে, এখন তারা কলেজে যাচ্ছে। আমার মতে পরিবর্তিত জীবন ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে শিক্ষার প্রসার ও সচেতনতা বৃদ্ধি।"[২]

যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়ন:

গ্রামের পরিবর্তনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতি। আগে গ্রাম ছিল অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন, বিশেষ করে বর্ষাকালে যাতায়াত ছিলো কঠিন। এখন সড়ক ও সেতু নির্মাণের ফলে বাজার, স্কুল, হাসপাতাল ও শহরের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ হয়েছে। পাশাপাশি মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ফেসবুক ও ইউটিউবের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষের চিন্তা-ধারনায় গভীর প্রভাব ফেলেছে। গ্রামের তরুণরা এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খবর জানে, অনলাইন শিক্ষায় অংশ নেয়, এমনকি ডিজিটাল মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতি প্রচার করে। এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তন মানুষকে তথ্যনির্ভর, সচেতন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলছে যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করছে।

প্রবাসী আয় ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি:

গ্রামের অনেক মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কর্মরত। এই প্রবাসী আয়ের মাধ্যমে গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামো বদলে গেছে। আগে যে পরিবারগুলো সম্পূর্নরূপে কৃষিনির্ভর ছিল, তারা এখন প্রবাসী রেমিট্যান্সের কারণে স্বচ্ছল জীবনযাপন করছে। এই আর্থিক উন্নয়ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। গ্রামে পাকা বাড়ি, দোকানপাট ও আধুনিক বাজার গড়ে উঠেছে। প্রবাসফেরত মানুষ বিদেশের উন্নত চিন্তা ও জীবনধারা নিয়ে এসে গ্রামীণ সমাজে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করেছে। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা

[২] সাক্ষাৎকার: মো: হাসান আলী (৪৫), ফুলহরি, শিক্ষকতা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজবাড়ি, ১ অক্টোবর ২০২৫।

সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক প্রভাবেও ভূমিকা রেখেছে। সুতরাং প্রবাসী আয় আমাদের গ্রামীণ পরিবর্তনের এক অন্যতম চালিকা শক্তি। সৌদি আরব প্রবাসী মিজানুর রহমান বলেন-

> "আমি সাত বছর ধরে বিদেশে কাজ করছি। আগে যোগাযোগ মানে ছিল চিঠি। এখন ভিডিও কল। আমি প্রতিদিন পরিবারের সঙ্গে কথা বলি। টাকা পাঠানো সহজ হয়েছে। আমার উপার্জনে পরিবার ভালো আছে। গ্রামের ঘরবাড়ি, শিক্ষা, পোশাক সব বদলে গেছে। আগে মানুষ বিদেশে গেলে কষ্ট পেত এখন অনলাইনে যোগাযোগে মনোবল থাকে। পরিবর্তিত জীবন আমাকে শিখিয়েছে-আধুনিকতা দূরত্ব কমিয়ে দেয়। এখন আমি গ্রামে বিনিয়োগ করছি-এটা পরিবর্তনের সেরা ফল।"[৩]

উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প ও এনজিও কার্যক্রম। ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, টিএমএসএস এর মতো সংস্থাগুলো ক্ষুদ্রঋণ, নারী উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা প্রসারে কাজ করছে।[৪] এই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচির মাধ্যমে নারীরা স্বনির্ভর হচ্ছে, দরিদ্র জনগণ আর্থিকভাবে শক্তিশালী হচ্ছে এবং সামাজিক পরিবর্তনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। সরকারি দিক থেকে বিদ্যুৎ, পানি, স্যানিটেশন, কৃষি সহায়তা ও রাস্তাঘাট উন্নয়নপ্রকল্প গ্রামীণ জীবনে বাস্তব উন্নতি ঘটিয়েছে। ফলে মানুষ শুধু অর্থনৈতিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও উন্নত জীবনধারার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই উন্নয়ন উদ্যোগগুলো গ্রামের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় নতুন ভারসাম্য এনেছে।

স্থানীয় সরকারব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ:

১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ এবং পরবর্তী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রামের মানুষ রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার হয়েছে। আগে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো কেবল শহরমুখী ছিল কিন্তু এখন গ্রামীণ জনগণই স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করছে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারী ও তরুণ প্রার্থীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে, যা রাজনৈতিক সচেতনতার প্রতিফলন। এই বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া মানুষকে রাজনীতির প্রকৃত অভিজ্ঞতা দিয়েছে। তারা এখন ভোটের মূল্য বোঝে এবং প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতার দাবি করে। ফলে স্থানীয় রাজনীতি এখন আর কেবল প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণে নেই; সাধারণ মানুষও নীতিনির্ধারণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখছে।

নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের প্রসার:

নারীর উন্নয়ন গ্রামীণ সমাজে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। এক সময় গ্রামের মেয়েদের স্কুলে যাওয়া ছিল সীমিত, কিন্তু এখন প্রায় প্রতিটি পরিবার মেয়েদের পড়াশোনায় উৎসাহী। এনজিও, সরকারি সহায়তা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে নারীরা শিক্ষিত ও আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে। তারা শুধু শিক্ষকতা বা হস্তশিল্প নয়, স্থানীয় রাজনীতি ও উদ্যোক্তা কর্মকাণ্ডেও অংশ নিচ্ছে। নারী এখন গৃহের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখছে, যা পরিবার ও সমাজে নতুন ভারসাম্য এনেছে। নারী নেতৃত্বের উত্থান সামাজিক রূপান্তরের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও এনেছে, কারণ এখন মেয়েরা স্বাধীনভাবে নিজের ভবিষ্যৎ গঠনের সুযোগ পাচ্ছে।

গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগের প্রভাব:

টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র এবং অনলাইন মাধ্যম গ্রামের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিপুল পরিবর্তন এনেছে। আগে গ্রামের মানুষ খবর জানতো ব্যক্তির মাধ্যমে, এখন তারা দেশের ও বিশ্বের ঘটনা মুহূর্তেই জানতে পারে। এই

---

[৩] সাক্ষাৎকার: মিজানুর রহমান (৩৬), ফুলহরি, সৌদি আরব প্রবাসী। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ভিডিও কলে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয় ২ অক্টোবর, ২০২৫।

[৪] গত ২৫ বছর গ্রামে যেসব পরিবর্তন হয়েছে তারমধ্যে সবচাইতে চোখে পড়ার মতো দু'টি দিক হলো ১. ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণ এবং ২. এনজিও কাঠামোর সম্প্রসারণ। ৭০ দশকের শেষ দিকে এবং ৮০ দশকে এনজিওগুলোর বেশি সম্প্রসারণ হয়। আনু মুহাম্মদ, *বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি* (ঢাকা: মীরা প্রকাশন), পৃ. ১৫।

গণমাধ্যম মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন, সামাজিকভাবে সক্রিয় ও সাংস্কৃতিকভাবে উন্মুক্ত করেছে। তরুণ প্রজন্ম এখন সামাজিক বিষয়ে মতামত দেয়, সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং নানা অনলাইন প্রচারণায় অংশ নেয়। তবে এক্ষেত্রে কিছু নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে– যেমন অতি আধুনিকতা ও নৈতিক অবক্ষয়। তবুও বলা যায়, গণমাধ্যম মানুষের চিন্তাভাবনায় বিপ্লব এনেছে, যা গ্রামীণ সমাজকে আধুনিকতার ধারায় নিয়ে এসেছে।

ধর্মীয় শিক্ষা ও সামাজিক সংহতি:

আমাদের গ্রামগুলো ধর্মীয়ভাবে ঐতিহ্যবাহী। ইসলামি শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ এখানকার মানুষের জীবনধারার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। স্থানীয় মসজিদ, মাদ্রাসা ও ওয়াজ-মাহফিল সমাজে ঐক্য, শান্তি ও ন্যায়ের বার্তা নিয়ে আসে। ধর্মীয় আলেম ও সামাজিক নেতারা নৈতিকতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরায় সমাজে অপরাধ ও নৈতিক অবক্ষয় হ্রাসে কাজ করছেন। ধর্ম মানুষকে ক্রমশ দায়িত্বশীল ও সমাজমুখী করে তুলছে। পাশাপাশি ঈদ, মাহে রমজান ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব সামাজিক মিলনমেলার রূপ নিচ্ছে। ফলে ধর্মীয় মূল্যবোধ সমাজে সংহতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহাবস্থানের মনোভাব জোরদার করছে।

জলবায়ু ও পরিবেশগত প্রভাব:

বাংলাদেশের হাওরাঞ্চলের জনজীবন প্রকৃতিনির্ভর। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও বন্যা সরাসরি মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে। কৃষি মৌসুম ও আয়ের অনিশ্চয়তার কারণে অনেকে বিকল্প পেশা হিসেবে ব্যবসা বা বিদেশে কাজ বেছে নিচ্ছে। এতে অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য এসেছে কিন্তু কৃষিজীবন ক্রমে সংকুচিত হচ্ছে। হাওরের প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবিকা পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবনধারা ও চিন্তাধারায়ও পরিবর্তন এসেছে। এখন গ্রামীণ মানুষ শুধু কৃষক নয়, বরং সেবা, বাণিজ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর পেশায় যুক্ত হচ্ছে। এই পরিবর্তন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় এক নতুন বাস্তবতা তৈরি করেছে।

প্রজন্মগত ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন:

তরুণ প্রজন্মের জীবনধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিকতার প্রভাব বেড়েছে। তারা প্রযুক্তি, ফ্যাশন ও বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত। আগে যেখানে গ্রামের বিনোদন মানে ছিলো যাত্রাপালা, পুতুলনাচ বা পালাগান, এখন তার জায়গা নিয়েছে ইউটিউব, ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। তরুণরা সামাজিক সমস্যার বিষয়ে বেশি সচেতন এবং পরিবর্তনের পক্ষে। তবে একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ, পারিবারিক বন্ধন ও সংস্কৃতির কিছু দিক হারিয়ে যাচ্ছে। এই প্রজন্মগত রূপান্তর গ্রামীণ সমাজকে আধুনিক করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে ঐতিহ্যের সংরক্ষণ একটি নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

গ্রামীণ সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের স্বরূপ:

পরিববার কাঠামো:

দুই দশক আগেও একান্নবর্তী বা যৌথ পরিবারের প্রচলন ছিল। দাদা-দাদি, চাচা-চাচী ও সব ভাইবোনেরা একই বাড়িতে বসবাস করতেন। বাবার জমিগুলো ছেলেরা মিলেমিশে চাষ করতেন। বাড়ির সকলে বয়োজেষ্ঠ্য ব্যক্তির কথামতো চলতেন। বাড়ির পুরুষেরা বাইরে জমিজমার কাজ করতেন। নারীরা রান্না-বান্না, গবাদি পশু, হাঁসমুরগিরর দেখাশোনা করা, মাড়াইকৃত মৌসুমী ফসল ঘরে তোলা, বাৎসরিক সম্ভব্য ধান সিদ্ধকরণ এবং ঋতুভিত্তিক কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকতেন।[৫] অধিক জমির মালিকরা একাধিক বিয়ে করতেন ফলে পরিবারে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বেশি ছিল। সাংসারিক কাজে অধিক ব্যস্ত থাকায় বাড়ির নারীরা ছোট বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়ার সুযোগ পেতেন না। সাধারণত এসব ছেলে-মেয়েরা বেশ বড় না হওয়া পর্যন্ত একসাথেই থাকতেন। যারা পড়াশোনা করতো তারা গ্রামবাসীর বেশ স্নেহ লাভ করতো। কিন্তু অধিক অর্থনৈতিক সচ্ছলতার অন্বেষণ, ব্যক্তি সাতন্ত্রবাদ এবং পেশাগত কারণে মানুষ গ্রাম থেকে শহরমুখী হওয়ায় যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছে। বর্তমানেও গ্রামগুলোতে একক

[৫]দলগত সাক্ষাৎকার: মো: মান্নান মিয়া (৭০), দুগলাচরী, কৃষি; রাবেয়া বেগম (৭১), দুগলাচরী, গৃহিনী; কাশেম মন্ডল (৬৫), দুগলাচরী, কৃষি; সেলিম মন্ডল (৬৮), লতিফপুর, কৃষি। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: মো: মান্নান মিয়ার বাড়ি, দুগলাচরী, মিঠাপুকুর রংপুর।

পরিবারের সংখ্যা অধিক। মুসলিম পরিবারগুলোতে পৃথক হওয়ার প্রবণতা বেশী।[৬] সাধারণত যে সকল পরিবারের কর্মক্ষম ছেলের সংখ্যা বেশী সেসকল সমাজে একক পরিবার অধিক লক্ষণীয়। চাকুরিরত ছেলেরা বিয়ের পরে স্ত্রীসহ কর্মস্থলে থাকায় একটি নতুন একক পরিবার গড়ে ওঠে অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত কম উপার্জনকারী এবং গ্রামে বসবাসকারী সন্তান পারিবারিক সম্মতিতে একটি একক পরিবার গড়ে তোলে।

সামাজিক স্তরবিন্যাস:

পূর্বে গ্রামীণ সমাজে স্তরবিন্যাসের প্রধান ভিত্তি ছিল জমি। যার যত জমি সমাজে তার প্রভাব প্রতিপত্তি তত বেশী ছিল। সারা বছর তিনবেলা খাবারের বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকাটা একটা গৌরবের ব্যাপার। 'গোলা ভরা ধান আর গোয়াল ভরা গরু' প্রবাদটি মূলত আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রতিচ্ছবি। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এসব পরিবারের উপর নির্ভরশীল ছিল। 'জোতদার', 'তালুকদার' ও ভুইয়া শ্রেণির বিশেষ সম্মান ছিল। সমাজে উক্ত পরিবারের সদস্যদের বিশেষ কদর ছিল। বিচার-সালিশ তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকতো। গ্রামে মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা, গোরস্থানসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাদের আর্থিক অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দূর-দূরান্ত হতে পুরুষ শিক্ষার্থীরা এসব বাড়িতে জায়গির থেকে পড়াশোনা করতো। হাতে নগদ অর্থ থাকলেও নিজেদের সন্তানদের পড়া-শোনার প্রতি সবিশেষ আগ্রহ ছিলো না।[৭] বাড়িতে বাৎসরিক টাকা কিংবা খাবারের বিনিময়ে একাধিক কাজের লোক থাকতো। পড়াশোনায় অপেক্ষাকৃত কম মনোযোগী হওয়ায় তারা পরবর্তীতে পিছিয়ে পড়ে। জমির মালিকানার গুরুত্ব থাকলেও ক্রমশ প্রতিপত্তির নতুন মাপকাঠি হলো শিক্ষা, চাকুরি, ব্যবসা এবং রেমিটেন্স বা প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ। অতিসম্প্রতি যুক্ত হয়েছে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে তৃণমূল পর্যায়ের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ।[৮]

নারীর অবস্থান:

নারীরা সাধারণত ঘরের কাজ করতো। বর্গাচাষী এবং ভূমিহীন কৃষক পরিবারের নারীরা পুরুষকে মাঠে সহযোগিতা করতো। তবে জমির অবস্থান বাড়ি হতে বেশি দূরে হলে নারীরা সাধারণত যেতো না। গৃহস্থালির কাজ বিশেষত খাবার তৈরি, পশুপালন ও সন্তান লালন-পালনই তাদের প্রধান কাজ ছিল। মাসিক বেতন কিংবা নগদ অর্থ উপার্জনের সুযোগ নারীদের ছিল না। অভিজাত পরিবারের বাড়ির বাইরে যেতো না বললেই চলে। অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো। সমাজে যৌতুক প্রথা প্রচলিত ছিল। বরপক্ষ আর্থিক স্বচ্ছলতায় যৌতুক হিসেবে নগদ অর্থই অধিক পছন্দ করতো। বর্তমানে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা এখন শিক্ষিত। শিক্ষা গ্রহণ ও দক্ষতা অর্জন করায় তারা কর্মক্ষম ও অপেক্ষকৃত সচেতন। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ও এনজিওর সহায়তায় অনেক নারী উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাকের প্রকল্পে গ্রামে অনেক নারী গবাদিপশু পালন, হস্তশিল্প ও ছোট দোকান পরিচালনা করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। মেয়েদেরকে অল্প বয়েসে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা ছিলো খুব বেশি যা এখন অনেকটাই কমে এসেছে। তবে কনে পক্ষ হতে এখন আর সরাসরি যৌতুক নেওয়া হয় না। যৌতুকের স্থলে উপহার শব্দটি অধিক প্রযোজ্য। গ্রামবাসী মনে করেন, এতে করে কনেপক্ষের উপর চাপ আরো বেড়েছে।

---

[৬] বাবু শৈলেন্দ্রনাথ বাইন (৭৫), ব্যবসা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: হৃদয় বাইন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকারদাতার বাড়ি, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

[৭] সাক্ষাৎকার: মো: শহিদুল ইসলাম (৫৫), চাকুরি, বরিশাল সদর, বরিশাল। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: ইসরাত জাহান ইথিকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নিজ বাড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

[৮] সাক্ষাৎকার: মো: রফিকুল ইসলাম (৭০) ফুলচাষী, গদখালী; মো: ওমর আলী (৬৫), গদখালী, ঝিকরগাছা, যশোর। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: রুবাইয়া তাসনিম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকারদাতার বাড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

গ্রামীণ রাজনীতি:

নেতৃত্বের পরিববর্তন: গ্রামে সালিশ বা পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল। পঞ্চায়েত অপেক্ষা সালিশ[৯] শব্দটি অধিক প্রচলিত। বিচারের দায়িত্ব ছিল মাতবর বা মাতুব্বর হিসেবে পরিচিত ভূসম্পত্তির মালিক শ্রেণির হাতে। বিচক্ষণতা অপেক্ষা আর্থিক স্বচ্ছলতাই ছিল মাতুব্বর হিসেবে মানার প্রধান নিয়ামক। তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হতো। এই নেতৃত্ব ছিল মূলত সম্মানও প্রথার উপর নির্ভশীল। তাদের জামিদারি, বংশমর্যাদা, ধর্ম, বয়স ক্ষমতার মূল উৎস ছিল কৃষি। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এ রকম একজন মাতুব্বর থাকতেন। সাধারণত তারা নিজ গ্রামের সমস্যাই সমাধান করতেন। তবে দু'চার দশ গ্রামে তাদের নাম-ডাক ছিল। একাধিক গ্রামের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত বিষয়ে মাতুব্বররা একসাথে বসে সমস্যা সমাধান করতেন। সমস্যাগুলো ছিল খুবই সাধারণ যেমন-জমি নিয়ে প্রতিবেশী কিংবা ভাইদের মধ্যে গণ্ডোগল, চুরি, অনৈতিক কর্মকাণ্ড করতে গিয়ে ধরা পড়া প্রভৃতি। ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করেও একাধিক গ্রামে সংঘর্ষ হতো।

বিগত কয়েক দশকে এ চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আধুনিক আইনি ব্যবস্থার কারণে ঐতিহ্যবাহী সালিশি ব্যবস্থার প্রভাব কমে গেছে। নব্বই-এর দশকের পর থেকেই গ্রামীণ রাজনৈতিক কাঠামোতে বড় পরিবর্তন আসে। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে ব্যাপকভাবে। মানুষ এখন ছোটখাটো বিষয়েও ইউনিয়ন পরিষদ বা আদালতের দ্বারস্থ হয় ফলে মাতুব্বর শ্রেণির সেই একচ্ছত্র ক্ষমতা এখন আর নেই। তাদের স্থান দখল করেছে জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতারা।

দলীয় রাজনীতির প্রভাব ও বিভাজন:

পূর্বে রাজনৈতিক নেতৃত্বে ছিল জমিদার ও প্রভাবশালী পরিবাবরের হাতে থাকায় সাধারণ জনগণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারতো না বরং নেতাদের অনুসারি হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকতে হতো। গ্রামীণ রাজনীতির সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এখন গ্রামীণ রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। পূর্বে এ নির্বাচন যতটা না রাজনৈতিক তার চেয়ে বেশি ছিল ব্যক্তিত্ব ও পারিবারিক প্রভাবের বিষয় কিন্তু বর্তমানে নির্বাচনে দলীয় প্রতীক গ্রহণের পর জাতীয় রাজনীতি গ্রামে প্রবেশ করেছে।[১০] গণমাধ্যম, টেলিভিশন, টকশো এবং বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে গ্রামের সাধারণ মানুষ এমনকি চায়ের দোকানের আড্ডাতেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বিরোধীদলের ভূমিকা সবকিছুই তাদের আলোচনার বিষয়। রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে পুরোনো বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্কে ফাটল ধরার উদাহরণও বিরল নয়। বর্তমানে মুরুব্বীদের উপর আস্থা থাকলেও আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তরুণপ্রজন্ম রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। গ্রামীণ রাজনীতি ক্রমশ উন্নয়নমূলক হয়ে উঠেছে। সড়ক, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন রাজনৈতিক প্রচারণার মূল বিষয় হয়ে উঠে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গ্রামগুলো প্রধানত দুটি বা একাধিক রজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভক্তি শুধুমাত্র নির্বাচনের সময় থাকে না বরং তা সারাবছর সামাজিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে।[১১] সরকারি বরাদ্দ, বয়স্কভাতা ও বিধবাভাতা প্রভৃতি সুবিধা এখন অনেকটাই রাজনৈতিক বিবেচনায় বন্টিত হয়। সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে এ সকল বিষয়ে অভিযোগ উঠে যে পূর্বে এগুলো সামাজিক বিবেচনায় বন্টিত হতো। এ সচেতনতা যেমন ইতিবাচক তেমনি এটি গ্রামীণ সমাজে নতুন ধরনের বিভাজন তৈরি করেছে।

---

[৯] সালিশ গ্রামের বহু পুরোনো প্রথা। ব্যক্তি মালিকানা, কর্তৃত্ব যতদিন থেকে এসেছে ততদিন থেকেই সম্ভবত সালিশ প্রথা রয়েছে। সালিশ প্রতি সপ্তাহেই গ্রামে একটি দু'টি বসে। সালিশে যেসব বিচার আসে গুলো আপাত দৃষ্টিতে খুবই তুচ্ছ মনে হয়। আনু মুহাম্মদ, *বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি* (ঢাকা: মীরা প্রকাশন), পৃ. ৪৮।

[১০] সাক্ষাৎকার: শচীন্দ্রনাথ ঘোষ (৬৫), ব্যবসায়ী, চুয়াডাঙা। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: কুমারি টুম্পা ঘোষ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

[১১] দলগত সাক্ষাৎকার: মো: রেজাউল করিম (৬৮), কৃষি, কেল্লাই; মো: ফজলুল হক (৭৫), কৃষি, কেল্লাই; মো: শাহজাদা মিয়া (৭০), গৃহস্থ, ঘিওর। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: রিজওয়ানা কারীম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকারদাতা মো: রেজাউল করিমের বাড়ি, ৫ অক্টোবর, ২০২৫।

অর্থনীতি:

যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি হলো তার গ্রামীণ অর্থনীতি। সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনধারা এবং উৎপাদন পদ্ধতিতে এসেছে পরিবর্তন। একসময় যে গ্রামগুলো ছিল মূলত সনাতন ও জীবনধারণ নির্ভর কৃষির উপর নির্ভরশীল তা আজ অধুনিক ও বাণিজ্যিক ও বহুমুখী অর্থনীতির দিকে ধাবিত।

বহুমুখী অর্থনীতিতে রূপান্তর:

গ্রামে আগে সনাতন পদ্ধতিতে চাষ হতো ফলে ফসল উৎপাদন কম হতো। কৃষিকাজে তখন গরু, কাঠের লাঙল ব্যবহার করা হতো। সেচব্যবস্থা ছিল সীমিত ফলে চাষাবাদ অনেকাংশে বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। ধান ও পাটের দাম বাজারে সবসময় স্থিতিশীল থাকতো না ফলে কৃষকদের বার্ষিক আয় কম এবং অনিশ্চিত ছিল। কৃষিকাজের বাইরে গ্রামের আয়ের অন্যান্য সুযোগ ছিল খুব সীমিত। ফলে বছরের একটি বড় সময় তাদের হাতে কাজ থাকতো না। মোবাইল ও ইন্টারনেটের মতো প্রযুক্তি গ্রামে পৌঁছায়নি। কৃষি সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

সেবা ও শিল্পখাত:

গ্রামের মানুষ প্রধানত কৃষিকাজেই সীমাবদ্ধ ছিল। ধান, পাট, গম, ডাল ও বিভিন্ন সবজি চাষই ছিল মানুষের প্রধান জীবিকা ও আয়ের উৎস।[১২] কিন্তু বর্তমানে কৃষির পাশাপাশি মানুষ বিকল্প আয়ের পথ খুঁজতে শুরু করেছে। বর্তমানে তারা শুধু কৃষির উপর নির্ভরশীল না থেকে অকৃষিজখাতে পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। গ্রামে ছোট ছোট দোকান, ওয়ার্কশপ, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। কৃষিকাজে উন্নত বীজ, হারভেস্টার ও স্প্রে মেশিন ব্যবহারের ফলে একই কাজে মানুষের সময় কম লাগছে এবং বাকী সময় অন্য কোনো অর্থনৈতিক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারছে। বর্তমানে বিভিন্ন সেবা ও ছোট শিল্পকার্যক্রম তাদের আয়ের নতুন উৎস হয়ে উঠেছে। দোকান, ফর্মেসি, জেন্টস পার্লার, মোবাইল সেবা, পরিবহন এসব সেবাখাত মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও কর্মসংস্থান তৈরি করছে। একই সঙ্গে হস্তশিল্প, সেলাই, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পোল্ট্রি ও দুগ্ধ শিল্পের মতো ক্ষুদ্র শিল্প গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও গতিশীল ও স্বনির্ভর করছে। গ্রামের অনেক যুবক শিক্ষা ও উন্নত জীবিকার জন্য বিদেশ যাচ্ছে। চাকরির জন্য তারা বিভিন্ন নির্মাণ ও সেবাখাতে কাজ করে তাদের অর্জিত অর্থ গ্রামে প্রেরণ করছে। প্রেরিত অর্থদিয়ে তাদের পরিবার উন্নত জীবনযাপন করছে। ঘরবাড়ি নির্মাণ, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ, ব্যবসার সম্প্রসারণ করতে পারছে। এ অর্থ শুধু সেই ব্যক্তির পরিবারের অর্থনীতি উন্নত করছেনা। পাশাপাশি সমগ্র গ্রামের অর্থনীতিকে উন্নত করছে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ:

বর্তমানে গ্রামে নারীদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামে বসবাসকারী চাকুরীজীবী নারীরা যেমন আয় করছেন তেমনি তাদের স্বামীদেরও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করতে সহায়তা করছেন। চাকুরিসুত্রে তারা গ্রামে থাকায় স্বামী-স্ত্রী মিলে স্থায়ী কোনো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে নতুন-নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করছে।

ডিজিটাল সেবা ও প্রযুক্তির ব্যবহার:

গ্রামে ডিজিটাল সেবা ও প্রযুক্তির ব্যবহার গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করেছে। মোবাইল ব্যাংকিংসহ অন্যান্য অনলাইন লেনদেন, ই-কমার্স, কৃষি অ্যাপ, ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্যসেবা সুবিধা গ্রামের মানুষকে সহজে ব্যবসা ও লেনদেন করতে সাহায্য করছে। এছাড়া প্রযুক্তিচর্চা, তথ্যপ্রাপ্তি এবং আধুনিক কৃষি ও সেবাখাতে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে। ফলে গ্রামের অর্থনীতি আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও বহুমুখী হয়ে উঠেছে।

---

[১২] সাক্ষাৎকার: অপু পোদ্দার (৫৬), ব্যবসায়ী, ভওয়াখালী। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: অর্পিতা পোদ্দার মৌ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নিজ বাড়ি, ১০ অক্টোবর, ২০২৫।

সংস্কৃতি:

খেলাধুলা:

কয়েক দশক আগে গ্রামে বিনোদনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল খেলাধুলা। জাতীয় খেলা হা-ডু-ডু হলেও সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ছিল ফুটবল। স্কুল পর্যায়ে কিংবা গ্রামভিত্তিক ফুটবলে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করতো। বর্ষাকালে উঠতি বয়সের কিশোররা বৃষ্টি-কাদা উপেক্ষা করেই ফুটবল খেলা চালিয়ে যেতো। প্রায় প্রতিমাসেই বিবাহিত এবং অবিবাহিতদের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হতো। অলস সময় কাটানোর জন্য তাস খেলা ছিল জনপ্রিয় মাধ্যম। বাড়িতে কিশোরীরা লুডু খেলতো। পূর্বে গ্রামে লাঠিখেলার ব্যপক প্রচলন ছিল। ঢোলের তালে তালে লাঠি খেলা হতো। এ খেলাতে কখনো কখনো লাঠির পরিবর্তে তলোয়ার ও ঢাল ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে খেলাটির প্রচলন নেই বললেই চলে। তবে মাঝে মাঝে কোনো অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে স্বল্প সময় এই খেলাটি খেলা হয়। এছাড়া আগে সাপ খেলা হতো যা স্থানীয়ভাবে ঝাপান নামে পরিচিত। এই খেলাটিও বর্তমানে বিলুপ্ত প্রায়। এছাড়া ঘোড় দৌড় আয়োজন করা হতো। বর্তমান সময়ে গ্রামে ক্রিকেট, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল প্রভৃতি খেলা হয়। মাঝে মাঝে বিবাহিত ও অবিবাহিতদের মধ্যে ফুটবল খেলা হয়।[১৩]

টেলিভিশন দেখা ছিল বিনোদনের আরেকটি মাধ্যম। প্রথমদিকে টেলিভিশন ছিল শুধুমাত্র গ্রামের বাজারগুলোতে। লোকজন স্থানীয় বাজারেই টেলিভিশন দেখতে যেতো। পরবর্তীতে গ্রামের সৌখিন ব্যক্তিরা আর্থিক সক্ষমতা সাপেক্ষে টেলিভিশন কিনেছিল। নারী-পুরুষ সকলেই টেলিভিশন দেখতে আগ্রহী ছিল। গ্রামের সকল বাড়িতে টেলিভিশন ছিল না। পুরো গ্রামে কিংবা একাধিক গ্রামে একটি বা দু'টি সাদাকালো টেলিভিশন ছিল। প্রতি শুক্রবার সাধারণত বাংলা সিনেমা হতো। অতি উৎসাহে লোকজন সিনেমা দেখতো। রাতে জনপ্রিয় সিরিজ যেমন- আলিফ লায়লা প্রভৃতি উপভোগ করতো। কোনো বাড়িতে রেডিও ছিল যার মাধ্যমে অডিও বিনোদন গ্রহণ করতো। স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট ছিল কল্পনার বাইরে। বর্তমান সময়ে একই পরিবারে একাধিক স্মার্ট ফোন রয়েছে। প্রত্যেক সদস্য তার ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী বিনোদন গ্রহণ করেন।

ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান:

গ্রামের অন্যতম মিলনমেলা হলো শীতকালীন ইসলামী মাহফিল। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণত ওয়াজ মাহফিলের ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় গ্রামের বাইরে থাকা পরিবারের সদস্য যারা কিনা শিক্ষা কিংবা কাজের উদ্দেশ্যে শহরে ছিল তারাও বাড়িতে এসে ওয়াজ-মাহফিলে যোগ দেয়। ইসলামী সম্মেলনকে কেন্দ্র করে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে উৎসব মুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিবহিত মেয়েরা তাদের বর এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে বাবার বাড়িতে আসে। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত দেওয়া হয়।

আগে একাধিক গ্রাম মিলে একটি মাত্র ঈদগাহ ময়দান ছিল। কিন্তু এখন ঈদগাহ ময়দানগুলো বেশ কাছাকাছি। বাৎসরিক মিলনমেলার এ জৌলুস অনেকাংশেই দেখা যায় না। পূজো-পার্বণ উপলক্ষে আয়োজিত মেলাতে হিন্দু-মুসলিম সকলেই একসাথে উপভোগ করে থাকেন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিয়েতে মুসলমানরা আগ্রহ সহকারে দেখতে গেলেও মুসলিম বিয়েতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপস্থিত খুবই নগণ্য।

খাদ্যাভাস ও পোশাক পরিচ্ছদ:

গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে পুরুষরা লুঙ্গি, শার্ট পরিধান করে। অপেক্ষাকৃত মুরুব্বিরা সাধারণত লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পড়ে থাকেন। তবে ফতুয়া পড়ারও প্রচলন রয়েছে। গ্রামের কৃষিজীবী পরিবারের পুরুষরা সাধারণত বাড়িতে ও বাইরে বেশিরভাগ সময় লুঙ্গি পড়েন।[১৪] চাকুরিজীবীরা বাড়ি থেকে বের হলে প্যান্ট পড়তেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

---

[১৩] সাক্ষাৎকার: মা: রমজান আলী মোল্লা (৭৮), গৃহস্থ, পুষ্পকাঠি; বিজন সরদার (৮০), গৃহস্থ, পুষ্পকাঠি। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: বৃষ্টি রাণী দাস। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নিজবাড়ি, ৫ অক্টোবর, ২০২৫।

[১৪] দলগত সাক্ষাৎকার: গোপাল চন্দ্র ঘোষ (৫৮), ব্যবসায়ী, ছনকা; রেজাউল করিম (৫১), ব্যবসায়ী, ছনকা; দীলিপ পরি (৪৫), ব্যবসায়ী, ছনকা। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: তিমন ঘোষ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার দাতা গোপাল চন্দ্র ঘোষের বাড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

তরুণরা আগে লুঙ্গি পড়লেও বর্তমানে জিন্স প্যান্ট, টি শার্ট কিংবা আধুনিক ডিজাইনের শার্ট পড়ে থাকেন। গ্রামে বড় হওয়া শিক্ষার্থীরা যারা বর্তমানে পড়াশোনা সংক্রান্ত কাজে শহরে কিংবা বাড়ির বাইরে থাকেন তারা বাড়িতে থাকা ভাই বোনের জন্য আধুনিক ডিজাইনের জামাকাপড় কিনে থাকেন। গ্রামীণ নারীরা শাড়ির পাশাপাশি এখন সালোয়ার-কামিজ কিংবা ম্যাক্সি ব্যবহার করেন। গ্রামে বর্তমানে শুধুমাত্র বয়স্ক নারীদের মধ্যেই শাড়ীর ব্যবহার দেখা যায়।[১৫]
খাদ্যাভাসের ক্ষেত্রেও এসেছে ব্যপক পরিবর্তন। একসময় সকালের প্রধান খাবার ছিল ভাত। কৃষক সাধারণত খুব ভোরে আগের রাতের রান্না করা অতিরিক্ত ভাত খেয়েই মাঠে চলে যেতেন। ভাত না থাকলে চিড়া-গুড় কিংবা মুড়ি খেয়ে মাঠে যেত। পরিবারের গৃহিনী কিংবা অন্য সদস্য সকালের নাস্তা নিয়ে আবার মাঠে যেতো। দুপরের খাবার সাধারণত মাঠের কাজ সেরে বাড়িতে এসে খেতে হতো। বেশির ভাগ সময়ই দুপুরের খাবার খেতে খেতে বিকেল হতো। দুপুরের খাবারে সাধ্যমতো ভালো তরকারি থাকতো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা মাছে সীমাবদ্ধ থাকতো। অঞ্চলভেদে গ্রামীণ হাটবারে বাজার করতে হতো। উৎপন্ন শস্যের একাংশ বিক্রি করেই হাটবারে বাজার করা হতো। বাজারের দিন রাতে অপেক্ষাকৃত ভালো রান্না হতো।[১৬]

সকালের নাস্তায় এখন বেশ পরিবর্তন এসেছে। স্বাস্থ্যসচেতন পরিবারগুলো সকালের নাস্তায় ডিম, আটার রুটি, পাউরুটি কিংবা প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবার খায়। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ফ্রিজ থাকার কারণে ভাত-মাছের পাশাপাশি মুরগি ও গরুর মাংসের চাহিদা বাড়ছে। কৃষক পরিবারের কর্তা ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে নিকটবর্তী বাজার থেকে ডিম-পরটা কিনে খেয়ে থাকেন। বিকেলে এখন গ্রামে ফাস্টফুডের চাহিদা বেড়েছে। তরুণরা পেশা হিসেবে চটপটি, ফুচকার দোকান দিয়েছে। এছাড়া শিশুদের জন্য নুডলস, চিপস এবং বড়দের মধ্যে গরমের দিনে বোতলজাত পানীয় গ্রহণের পরিমাণ বাড়ছে।[১৭] গ্যাসের চুলা ও উন্নত বাজারজাতকরণের ফলে রান্নার ধরনেরও পরিবর্তন এসেছে। আধুনিকতার প্রভাবে গ্রামীণ জনগণের পোশাক ও খাদ্যাভাস বৈচিত্রময় ও উন্নত হয়েছে।

গ্রামীণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলাফল:

রাজনৈতিক:

গ্রামের রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিবর্তনের ফল সবচেয়ে দৃশ্যমান। আগে গ্রামীণ রাজনীতি ছিলো প্রভাবশালী পরিবারের হাতে সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষ ভোট দিলেও সিদ্ধান্তে অংশ নিতে পারতো না। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক সচেতনতা ও শিক্ষা বৃদ্ধির ফলে জনগণ নিজের মতামত প্রকাশে সাহসী হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক। নারী ও তরুণ প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, যা রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকে প্রসারিত করেছে। এতে রাজনৈতিক চর্চা স্থানীয় পর্যায়ে দৃঢ় হয়েছে। মানুষ এখন নেতার কাছে জবাবদিহিতা দাবি করছে, উন্নয়ন প্রকল্পে স্বচ্ছতা বাড়ছে। তবে এর পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কখনও কখনও দলাদলি ও সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি করছে যা গ্রামীণ সম্প্রীতির জন্য চ্যালেঞ্জ।[১৮] তবুও সার্বিকভাবে এই পরিবর্তন রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করেছে।

---

[১৫] দলগত সাক্ষাৎকার: মোছা: সালেহা খাতুন (৬৯), গৃহিনী, নলকূড়া; আব্দুর রহিম খন্দকার (৭২), গৃহস্থ, নলকূড়া; মো: জাহির শেখ (৭৫), কৃষি, নলকূড়া। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: মিথিলা ইসরাত। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নিজবাড়ি, ২২ অক্টোবর, ২০২৫।

[১৬] দলগত সাক্ষাৎকার: ফুলি বেগম (৬০), গৃহিনী, হাবিব নগর; জব্বার সরদার (৭৬), গৃহস্থ, হাবিব নগর; রুস্তম আলী গাজী (৪৫), কৃষক, হাবিব নগর; কামরুল গাজী (৪২) ব্যবসায়ী, হাবিব নগর; শেখ লাকী (৫৫), ইউপি সদস্য। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: জুবায়ের রানা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নিজবাড়ি, ১০ অক্টোবর, ২০২৫।

[১৭] সাক্ষাৎকার: শাহজাহান হওলাদার (৫৬), শিক্ষকতা, গৈলা; মো: মনসুর আলী (৫০), কৃষি, গৈলা। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: আশিকুর রহমান। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নিজবাড়ি, ১৫ অক্টোবর, ২০২৫।

[১৮] সাক্ষাৎকার: ইদ্রিস আলী (৬০), কৃষি, বরিশাট; খলিলুর রহমান (৬৫), গৃহস্থ, বরিশাট। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: রায়হানা আফরোজ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নিজবাড়ি, ১০ অক্টোবর, ২০২৫।

সামাজিক জীবন:

সামাজিক পরিবর্তনের ফলে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা আধুনিক, সচেতন ও সংগঠিত হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগের উন্নতির কারণে মানুষের জীবনমান বেড়েছে। আগে যেখানে গ্রামীণ সমাজে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও বৈষম্য ছিলো প্রকট, এখন সেগুলো অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে পারিবারিক সিদ্ধান্তে নারীর ভূমিকা বেড়েছে। সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ই সমান মর্যাদা পাচ্ছে। তবে সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছু নেতিবাচক প্রভাবও এসেছে যেমন-আত্মীয়তার বন্ধন ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রবণতা কিছুটা দুর্বল হয়েছে, মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হচ্ছে। তবুও বলা যায়, এই পরিবর্তনের ফলে একটি উন্নয়নমুখী, সচেতন সমাজ গড়ে উঠছে।

অর্থনৈতিক:

প্রবাসী আয়, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমের বিস্তারের ফলে গ্রামের অর্থনীতি নতুন প্রাণ পেয়েছে। কৃষিনির্ভর জীবন থেকে মানুষ এখন ক্ষুদ্র ব্যবসা, শিক্ষাক্ষেত্র ও সেবাখাতে যুক্ত হচ্ছে। অনেক পরিবার এখন স্বচ্ছল জীবনযাপন করছে। গ্রামে নতুন বাজার, দোকানপাট, স্কুল, পাকা রাস্তা ও মসজিদ গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের এই ফলেই দারিদ্র্য ও বেকারত্ব অনেক কমেছে। তবে এর সঙ্গে গ্রামীণ বৈষম্যও কিছুটা বেড়েছে ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, আর দরিদ্ররা পিছিয়ে পড়ছে। তবুও সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক পরিবর্তন গ্রামের সামাজিক অবস্থানকে উন্নত করেছে এবং মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করেছে।

শিক্ষা ও সচেতনতা:

শিক্ষার প্রসার গ্রামীণ সমাজে এক বিপ্লব ঘটিয়েছে। শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হার বেড়েছে এবং মেয়েদের শিক্ষায় আগ্রহ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন প্রায় প্রতিটি পরিবার তাদের সন্তানকে উচ্চশিক্ষায় পাঠাতে আগ্রহী। শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম সমাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে, কেউ শিক্ষকতা করছে আবার কেউ সরকারি চাকরিতে যাচ্ছে। এর ফলে মানুষের মধ্যে অধিকার সচেতনতা, নাগরিক দায়িত্ববোধ ও সামাজিক ন্যায়ের ধারণা বেড়েছে। তবে আধুনিক শিক্ষা ও শহুরে জীবনধারার প্রভাবে কিছু তরুণ গ্রামের ঐতিহ্যের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ছে, যা সাংস্কৃতিক ভারসাম্যের জন্য উদ্বেগজনক। তবুও শিক্ষা গ্রামের উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় ইতিবাচক ফলাফল হিসেবে বিবেচিত।

সংস্কৃতি:

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গ্রামগুলো এখন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক মিশ্র সমাজে পরিণত হয়েছে। আগে গ্রামীণ সংস্কৃতিতে ছিল পালাগান, বাউল সঙ্গীত, নাট্য আয়োজন ও ধর্মীয় উৎসবকেন্দ্রিক সামাজিক মিলন।[১৯] এখনো সেই ঐতিহ্য রয়ে গেছে, কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যম সংস্কৃতিকে নতুন রূপ দিয়েছে। তরুণরা এখন নিজস্ব সঙ্গীত, ভিডিও ও নাটক তৈরি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এতে সংস্কৃতির নতুন মাত্রা সৃষ্টি হয়েছে, তবে পাশ্চাত্য প্রভাবের কারণে কিছু ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। অনেকে স্থানীয় লোকসংস্কৃতিকে গ্রাম্য ভাবছে, যা সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের জন্য চ্যালেঞ্জ। তবুও সার্বিকভাবে বলা যায়, গ্রামের সংস্কৃতি এখন অধিক মুক্ত, অংশগ্রহণমূলক ও বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে।

ধর্মীয় ও নৈতিক:

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনের একটি ভারসাম্য রক্ষা করেছে। আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি শিক্ষা ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডও বৃদ্ধি পেয়েছে। মসজিদ-মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়েছে, ওয়াজ-মাহফিল, ইসলামী বক্তৃতা ও দাওয়াতি কার্যক্রম মানুষকে নৈতিক পথে উৎসাহিত করছে। তবে কিছু তরুণ আধুনিক সংস্কৃতির প্রভাবে ধর্মীয় চর্চায় অনাগ্রহী হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে নৈতিক সংকটের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। সামগ্রিকভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ গ্রামের সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

---

[১৯] সাক্ষাৎকার: আব্দুর রহমান (৫০), গৃহস্থ, পুলুরিয়া। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: আশিক হোসাইন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নিজবাড়ি, ২৫ অক্টোবর, ২০২৫।

নারীর অবস্থান:

নারী এখন আর শুধু গৃহস্থালির কাজে সীমাবদ্ধ নয় তারা শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও অগ্রগামী। নারী উদ্যোক্তা, শিক্ষক ও সমাজকর্মীদের সংখ্যা বেড়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর মতামত সম্মান পাচ্ছে। এতে পরিবারে সমতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ছে। সমাজে নারীর মর্যাদা বেড়েছে এবং শিশুশিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সচেতনতায় নারীরা অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে কর্মব্যস্ততার কারণে পারিবারিক সম্পর্ক ও ঐতিহ্যবাহী ভূমিকার পরিবর্তনও দেখা যাচ্ছে। তবুও নারীর উন্নয়ন গ্রামের সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম সফল ফলাফল।

প্রযুক্তি ও যোগাযোগ:

প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে গ্রামগুলো এখন ডিজিটাল সংযোগে যুক্ত। মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন কেনাবেচা, অনলাইন শিক্ষা এবং সোশ্যাল মিডিয়া যোগাযোগ মানুষকে সময় ও দূরত্বের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করেছে। তরুণ প্রজন্ম এখন প্রযুক্তিনির্ভর চাকরি ও উদ্যোক্তা কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে। এতে কর্মসংস্থান বাড়ছে, পাশাপাশি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিও গড়ে উঠছে। তবে প্রযুক্তির অপব্যবহার যেমন ভুয়া তথ্য, সময় অপচয় ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মতো সমস্যা তৈরি করছে। তারপরও প্রযুক্তি গ্রামের আধুনিকায়ন ও সচেতনতার ক্ষেত্রে এক অনন্য ইতিবাচক ফলাফল এনে দিয়েছে।

পরিবেশ ও জীবিকা:

জলবায়ু পরিবর্তন ও হাওরাঞ্চলের প্রকৃতি গ্রামের অর্থনীতি ও জীবনধারায় প্রভাব ফেলেছে। কৃষি মৌসুমের অনিশ্চয়তা মানুষকে বিকল্প জীবিকায় ঠেলে দিয়েছে, যেমন- ব্যবসা, চাকরি ও প্রবাসে যাওয়া। এর ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু ঐতিহ্যবাহী কৃষি সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে মানুষ এখন পরিবেশ সচেতন হয়েছে, বৃক্ষরোপণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে অংশ নিচ্ছে। পরিবেশ সংক্রান্ত এই সচেতনতা গ্রামীণ উন্নয়নকে টেকসই করেছে।

সামাজিক মূল্যবোধ:

আধুনিকতার প্রভাবে মানুষের চিন্তা, আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্কেও পরিবর্তন এসেছে। আগে গ্রামীণ সমাজে ছিলো পারস্পরিক সহানুভূতি, অতিথিপরায়ণতা ও সম্মিলিত সামাজিকতা–এখন তা অনেকাংশে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে।[২০] তবে একই সঙ্গে মানুষ এখন মানবাধিকার, নারীর অধিকার ও সামাজিক সমতার পক্ষে দাঁড়াচ্ছে। ন্যায়বোধ, সহনশীলতা ও মানবিকতার ধারণা বেড়েছে। সুতরাং, সামাজিক মূল্যবোধের এই পরিবর্তন একদিকে ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করছে, অন্যদিকে মানবিক সমাজ গঠনের সুযোগ তৈরি করছে।

উপসংহার:

সামষ্টিক আলোচনায় বোঝা যায়, গ্রামীণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারা মূলত সময়ের দাবি ও উন্নয়নের ফলাফল। এই পরিবর্তন গ্রামকে করেছে প্রগ্রতিশীল। গ্রামের মানুষ এখন অধিক সচেতন, সংগঠিত ও আত্মনির্ভরশীল। গ্রামীণ সমাজ একসময় প্রথাগত ধীরগতিও সীমাবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে ছিল। পরিবর্তনশীল গ্রামীণ সমাজের প্রতিচ্ছবি যা জাতীয় রাজনীতি ও বিশ্বায়নের প্রভাব বহন করছে। অধিক উৎপাদিত ফসল এবং রেমিটেন্স গ্রামের গতিপথ নির্ধারণ করছে। অন্যদিকে প্রযুক্তির কল্যাণে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এলেও স্থানীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক মূল্যাবোধের সাথে আধুনিকতা একধরনের সমন্বয় সাধিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনগুলো গ্রামের জন্য নতুন সম্ভবনা তৈরি করছে তেমনি পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক বৈষম্যের মতো চ্যালেঞ্জও নিয়ে এসেছে। তবে গ্রামীণ কিংবা শহর সকল ক্ষেত্রেই আধুনিকতার এই স্রোতে ঐতিহ্য, মানবিক মূল্যবোধ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা জরুরি।

---

[২০] সাক্ষাৎকার: আব্দুল মান্নান মোল্যা (৬০), গৃহস্থ, বড়বাড়ি; আব্দুল ছাত্তার বিশ্বাস (৫৫), ব্যবসায়ী, বড়বাড়ি। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: বাপ্পি ইসলাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নিজবাড়ি, ২০ অক্টোবর, ২০২৫।